বহুরূপে সম্মুখে তোমার

সম্পাদনা
স্বামী চিদ্‌রূপানন্দ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

এক যুগনায়ক, যুগপুরুষ, যুগাচার্য, নেতার প্রয়োজন—ঠিক যুগ সন্ধিক্ষণে, যুগ প্রয়োজনে। প্রাচীনকাল থেকে এইরূপ যুগ পুরুষের আবির্ভাব হয়ে আসছে। তাঁদের আবির্ভাবের একটা উদ্দেশ্য আছে। সমস্ত বিশ্ব ও ভারতবর্ষ যখন এক সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তিনি ছিলেন সনাতন ভারতবর্ষের সপ্তঋষির এক ঋষি। উপনিষদ যুগে তাঁদের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল সনাতন বেদান্ত। যুগে যুগে তাঁরা আসেন সনাতন বেদান্তের বাণী শুনাতে। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে পুনর্জাগরিত করতে আসেন। বর্তমান আধুনিক যুগে ভোগবাদের প্রভাব থেকে মানুষের মনের উন্নতি ঘটিয়ে ভারত ও বিশ্বকে রক্ষা করাই তাঁর আসার উদ্দেশ্য। তাই এই যুগের বাণী হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে—মানুষের অন্তর নিহিত সত্ত্বার বিকাশ, চরিত্র গঠন, মানুষ তৈরি অর্থাৎ মানুষের সার্বিক উন্নতি। সকল মহাপুরুষ তাঁদের সঙ্গে পার্ষদ নিয়ে আসেন যুগ-ধর্ম প্রচারে। রাম-হনুমান, কৃষ্ণ-অর্জুন, বুদ্ধ-আনন্দ, যিশু-সেন্ট পল— তেমনি এযুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব। একে অপরের পরিপূরক। শ্রীরামকৃষ্ণ উৎস এবং বিবেকানন্দ গতি ও ভাব।

পৃথিবীর ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব—আমরা যখন কোনো ব্যক্তির জীবনী নিয়ে আলোচনা বা ক্লাসিফাই করি তখন তাঁকে হয়তো একটা বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখি—যেমন তিনি একজন সাহিত্যিক, কিংবা দার্শনিক, কিংবা রাজনীতিবিদ, কিংবা পদার্থবিজ্ঞানী ইত্যাদি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী নিয়ে যখন চিন্তা করা হয় তখন ভাবি এই জীবনটি কোনো বিষয়ের মধ্যে রাখব। ধর্ম, সমাজ, দর্শন, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, জ্যোতিষ—সব বিষয় যেন এটি মহাপুরুষের মধ্যে সমন্বয়। স্বামী বিবেকানন্দ যেন একটি ফুলের সাজি—সমস্ত ভাব ও আদর্শের সমন্বয়ে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছে। A versatile genious এক পূর্ণাঙ্গ মানবিক উৎকর্ষে প্রকাশিত এক ব্যক্তিত্ব। এই বিবেকানন্দ হওয়ার পিছনে যে বিরাট ইতিহাস আছে। আমরা এখন সেই ইতিহাসটি অনুধ্যান করতে চলেছি।

একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা অন্যদিকে গুরুর নিকট সনাতন ভারতের ধর্ম শিক্ষা। দুয়ের সমন্বয়ে বিবেকানন্দ হয়ে উঠেছিল একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব পুরুষ—সন্ন্যাসী, যোগী, ভক্ত, কর্মী, জ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্মগুরু, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আচার্য, বাগ্মী, ক্রীড়াকৌতুক-রহস্য নিপুণ, সংগঠক, জাতীয়তাবাদী, মানবতাবাদী, সমাজবাদী, ভারতপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক।

অতএব বিবেকানন্দের জীবনের ইতিহাস অনুধ্যান ও আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। পূর্ণ বিকশিত এক অপূর্ব ব্যক্তিত্ব এবং সেই ব্যক্তিত্ব গঠনের পিছনে শিক্ষা ছিল সনাতন ভারতের শাস্ত্র, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধারণ মানুষের জীবন। দ্বিতীয়ত তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য প্রধানত দুটি দিকে—মানুষ তৈরি ও দেশ গঠন। স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনের প্রধান সংকল্প মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করে তোলা। তিনি সর্বদাই বলতেন, মানুষ গড়াই তাঁর একমাত্র জীবনের লক্ষ্য। তিনি বলতেন—Man making is my mission. স্বামীজির বাণী ছিল এই মানুষ গড়ার উপাদান যা বেদান্তের বাণী বা মুক্তির বাণী। তাঁর প্রধান কর্ম ছিল ভারতবর্ষের পুনরুত্থান। বিবেকানন্দ নামটি যেন এক ঘনীভূত ভারতবর্ষ। তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে সমগ্র সনাতন ভারতবর্ষ যেন প্রকাশিত হচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্বকে গড়ার জন্য, ভারতবর্ষ যেন তাঁর চিরন্তন আধ্যাত্মিকতা বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। বিবেকানন্দের এই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবকে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, 'বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁর গুরু বলেছিলেন, তিনি জগৎকে দুহাতে ধরে বদলে দেবার মতো শক্তিমান পুরুষ, সেই বিবেকানন্দের যাত্রা জগতের সামনে প্রথম প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিল, ভারত জেগেছে—শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়, জয় করবার জন্য সে জেগেছে। The going forth of Vivekananda, marked out by the Master as the heroic should destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that India was awake not only to survive but to conquer...

শ্রীঅরবিন্দ আরও বলছেন, সেন্ট পল কে দেখে যিশু ছবির মতো স্পষ্ট দেখেছিলেন যে, সেন্ট পল রোমে দাঁড়িয়ে যে ভাব প্রচার করছেন, সেই ভাব সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে। তেমনি যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমন করলেন, তাঁকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে, সমস্ত ভারত তাঁর নিকট আসছে, সমস্ত ভারত তাঁর পদতলে মস্তক লুটাচ্ছে, সমস্ত ভারত সর্বস্ব তাঁকে দান করতে আসছে। ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অপূর্ব মূল্যবান কথা বলেছেন। ঠাকুরের সম্বন্ধেও বলেছেন এবং বিবেকানন্দের সম্বন্ধেও বলেছেন। তিনি রোমাঁরোলাঁকে বলছেন, If you wish to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative. 'যদি ভারতবর্ষকে জানতে চান তবে বিবেকানন্দ পড়ুন। সবকিছুই ইতিবাচক।' স্বামীজি নিজেই ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজেকেই বলতেন আমি ভারতবর্ষের ঘনীভূত রূপ। I am a condensed India. India beat in his pulses, India was his daydream, India was his nightmare. Not only that. He himself became India. He was the embodiment of India in flesh and blood. He was India, he was Bharat—the very symbol of her spirituality, her purity, her wisdom, her power, her vision and her destiny. ওই ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজির গভীরতম আবেগের কেন্দ্র...ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হত তাঁর বুকের মধ্যে, প্রধ্বনিত হত তাঁর ধমনীতে। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর দিবাস্বপ্ন, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর নিশীথের দুঃস্বপ্ন। শুধু তাই নয়। তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ—রক্তে মাংসে গড়া ভারতপ্রতিমা। ...ভারতের আধ্যাত্মিকতা, তার পবিত্রতা, তার প্রজ্ঞা, তার স্বপ্ন এবং তার ভবিষ্যৎ—সব কিছুর তিনি ছিলেন প্রতীকপুরুষ। মাতৃভূমি ভারতবর্ষই ছিল তাঁর একমাত্র উপাসনা। The queen of his adoration was his motherland.

একবার জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বামীজি কি করে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি? স্বামীজি উত্তরে বললেন, 'Love India'। স্বামীজির জীবন অনুধ্যান মানে ভারতবর্ষের অনুধ্যান। মাতৃভূমির অনুধ্যান। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর অতীত ঐতিহ্য, বর্তমানে তাঁর অধঃপতন, ভবিষ্যতে তাঁর আবার চৈতন্যের শক্তিতে জাগরণ।

ভারতের পুনঃজাগরণে সম্বন্ধে স্বামীজি চেয়েছেন, ভারতের আদর্শপরায়ণতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের কর্ম-কুশলতার যোগসাধন ঘটাতে। তাঁর মতে ভারতের আদর্শ হচ্ছে—ত্যাগ ও সেবা। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করবে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জীবনযাপন করবে। ব্যক্তিগত সুখের জন্য জীবন নয়। সমষ্টির কল্যাণেই ব্যষ্টির কল্যাণ। 'জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'—অর্থাৎ জন্ম থেকেই সমষ্টির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গীকরণ করবে। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। অর্থাৎ ভারত দেখাবে জগৎকে পথ। বেদান্তের সঙ্গে মনুষ্যত্বের যোগ। নতুন ভারত বেরুক—এক সুন্দর, সুস্থ, গঠনমূলক, শূদ্র-ব্রাহ্মণ শক্তির যোগসাধনে, মন-বুদ্ধি-হৃদয়ের ঐশ্বর্য নিয়ে, বিজ্ঞানের সহায়তায় অভ্যুত্থান ঘটুক।

অতএব আমরা যদি স্বামীজিকে ভালোবাসতে চাই বা স্বামীজির কাজ করতে চাই

তবে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে 'Love India'—ভারতবর্ষকে ভালোবাসা। ভারতবর্ষকে যদি আমরা ঠিকঠিকভাবে ভালোবাসতে পারি তবেই আমাদের জীবন ও কাজ গঠন মূলক হবে নচেৎ ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠবে। এই ভারতবর্ষকে কীভাবে ভালোবাসা? মাতৃরূপে ভালোবাসা। নিজের গর্ভধারিণী মা-রূপে ভালোবাসা। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতপরিক্রমা করে দুঃখিত হয়ে বলছেন—তোমরা একবার ভালো করে দ্যাখো, তোমরা কী তোমাদের মাতৃভূমিকে দেখতে পাচ্ছ না। এ পাহাড় তোমার মায়ের দেহ, এই নদ-নদী তোমার মায়ের শিরা ধমনী। এই দেশকে যদি না তোমরা তোমাদের মাতৃভূমিরূপে দেখ তবে কখনোই এই মাকে মুক্ত করতে ও মঙ্গল করতে তোমরা জীবন দিতে পারবে না। এই মায়ের অত্যাচার তোমরা আজ চোখ বুজে দেখছ। সেই অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও।

বিবেকানন্দের জ্বালাময়ী বাণী উচ্চারণ করতে করতে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিতে ভয় পায়নি। তাঁরা গীতা ও স্বামী বিবেকানন্দ পড়তেন ও মুখস্ত করতেন। গীতার অমর মন্ত্র 'নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।' কিংবা 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ মার্থ নৈতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।' হে অর্জুন, ক্লীবভাব আশ্রয় করিও না। তুমি আত্মা তোমাকে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করা বা অগ্নি দ্বারা দহন করা যায় না। তুমি অমর চির নিত্য। তুমি আত্মা, তুমি দেহ নও। সেই সঙ্গে বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ পাঠ।

স্বামীজি ভারত সম্বন্ধে বলছেন, এই সেই ভারত, যে ভূমিতে আধ্যাত্মিক প্রবাহ সমুদ্রের মতো বিশাল, যে দেশের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ ঋষিমুনিদের পদধূলিতে পবিত্র হয়েছে। এইখানে সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হয়েছিল, মানুষ নিজ নিজ স্বরূপ অনুসন্ধান করে, এখানে জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর, উপলব্ধি করে অমৃতত্ত্ব লাভ করেছে। ভারত কী মরে যাবে? তা হলে সমস্ত পৃথিবী থেকে আধ্যাত্মিকতা মুছে যাবে। ভারতই সমস্ত পৃথিবীকে পথ দেখাবে। তাই এই সার্ধশততম বর্ষে স্বামী বিবেকানন্দের অনুধ্যান মানে চির সনাতন ভারতবর্ষকে পূজা করা।

জানুয়ারি, ২০১৩ স্বামী চিদ্রূপানন্দ

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। স্বামীজিকে জাতীয় জাগরণের পিতা বললে অত্যুক্তি হবে না। জাতির কোন একটি বিশেষ দিক নয়, তার সমগ্র সত্তার যাতে পরিপূর্ণ বিকাশ হয় এই ছিল তাঁর বাণীর লক্ষ্য। তিনি আমাদের যুগ যুগান্তব্যাপী মোহনিদ্রা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। শিকাগো মহাসম্মেলনে তাঁর সাফল্য কোন এক ব্যক্তির সাফল্য নয়—সমগ্র ভারতবর্ষের সাফল্য। এই সাফল্যের ফলে ভারতাত্মা জেগে উঠেছে। আমাদের আত্মগ্লানি ও হীনমন্যতা বোধ অপসারিত হয়েছে। বিদেশী শাসনের অবসানকল্পে স্বামীজির জীবন ও বাণী এই দেশের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। নারীজাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। বাস্তবিকভাবে তিনি যুগপুরুষ—মানব ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

পুনশ্চ'র উদ্যোগে স্বামীজির সার্ধ জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর জীবন, বাণী ও তাঁর প্রভাব সম্পর্কে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনা করেছেন বর্তমান গ্রন্থে। তাঁদের সকলকে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। এই গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রীমতী আঁখি সিন্‌হা রায়-এর নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা মুগ্ধ। পুনশ্চ'র শ্রী সন্দীপ নায়কের জন্য এই গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হোল। এই গ্রন্থটি যদি পাঠকদের কিছুমাত্র ভাল লাগে এবং আমাদের জীবন গঠনে সাহায্য করে তাহলে এই উদ্যোগ সফল হবে।

অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য
শুভাশিস চৌধুরী

জানুয়ারি, ২০১৩

সূচিপত্র

বিবেকানন্দ : শিকাগোর পরে / অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৫

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন / রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ২৩

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম/শুভাশিস চৌধুরী ৩৩

দেশনায়ক বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্র / পিনাকী ভাদুড়ী ৪১

স্বামীজির ধর্মচেতনা / স্বামী অমলাত্মানন্দ ৫৯

বৈদান্তিক বিবেকানন্দের কর্মসাধনা/ স্বপন মুখোপাধ্যায় ৭১

স্বামী বিবেকানন্দ, 'ভারতী পত্রিকা' ও সরলা দেবীচৌধুরানি / বারিদবরণ ঘোষ ১০১

স্বামীজির সাহিত্যচেতনা / পাঁচুগোপাল বক্সি ১২৫

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা / সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী ১৬৩

স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচেতনা /ড. সরোজ ঘোষ ১৮১

স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা / গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৫

নারী-জাগরণ : স্বামী বিবেকানন্দ / বন্দিতা ভট্টাচার্য ২১৯

স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ / তরুণ গোস্বামী ২২৯

বিবেকানন্দের চিন্তায় : 'মায়া' / পূর্বা সেনগুপ্ত ২৪১

মূল্যবোধের সংকটে বিবেকানন্দ প্রদর্শিত ধর্মাদর্শ / ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ ২৫৭

জাতীয় সংহতির মূর্ত্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ / ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ ২৬৫

স্বামী বিবেকানন্দের অপার্থিব সংগীত প্রতিভা / স্বামী চিদ্‌রূপানন্দ ২৭৩

বিবেকানন্দ—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যভাবনা / কৃষ্ণা রায় ২৯৭

স্বামীজির অনন্যমাত্রিক আহার-অভিরুচি / গৌরী মিত্র ৩১৫

অনন্য বিবেকানন্দ / ড. জয় ভট্টাচার্য ৩৩৩

Education and Swami Vivekananda / Professor (Dr) Radharaman Chakrabarti ৩৪৫

বিবেকানন্দ : শিকাগোর পরে

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য সাফল্য সংবাদ প্রথম যখন ভারতে পৌঁছে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তখন তার স্রোতে এ দেশি রক্ষণশীলেরা গা-ভাসান দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতে ফিরে লোকটি এসব কী বলতে শুরু করেছে? মারাত্মক সব কথা! ভারতের ধর্ম ভাতের হাঁড়ির ধর্ম; যে দেশে অস্পৃশ্যতা থাকে সে দেশ পাগলা গারদ, মানুষগুলো পাগল; ওইসব নির্বোধরা নিজেদের দেশাচারকে মনে করে ধর্ম, আর সেই সঙ্কীর্ণ দেশাচারের বদল চাইলেই ধর্ম গেল গেল বলে চেঁচায়; এই কুসংস্কারচ্ছন্ন ঝনপিণ্ডগুলোর চেয়ে নাস্তিকও ভাল, নাস্তিকদের তবু প্রাণের তেজ আছে; পুরাতন জাতিভেদ প্রথা পচে গিয়ে দেশের চর্তুদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে; দেশ ভরে আছে পৌরোহিত্যের আবর্জনায়; ধর্ম চাই, ভারতের মেরুদণ্ড ধর্ম, ধর্ম বাদ দিয়ে এ দেশে কোনও কাজ সফল করা যায় না, যাবে না; কিন্তু সে ধর্ম বিশেষ নামধারী ধর্ম নয়, সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত নিত্য সত্যের ধর্ম, যা বিশ্বাস করে মানুষের অন্তর্গত দেবত্বে—এসব কি ভয়াবহ কথা! রক্ষণশীলদের মধ্যে গেল গেল রব উঠল। বিবেকানন্দের যে সব 'অন্যায়' কার্যের সম্বন্ধে এতদিন উদাসীনতার পর্দা ঝোলান ছিল, তা উঠিয়ে তাঁকে বেআব্রু করা হতে লাগল। হিন্দু সন্ন্যাসী বলে দাবীদার বিবেকানন্দ মোটেই হিন্দু নন, কারণ কালাপানির পারে গিয়ে জাত হারিয়েছেন—তিনি কায়স্থ শূদ্র, তাই সন্ন্যাসীও নন, ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ সন্ন্যাসী হতে পারে না; কোন আর্যধর্মী ম্লেচ্ছদেশে যাবার কথা চিন্তা করতে পারেন না; ম্লেচ্ছদেশে গেলেই আর্য-আধ্যাত্মিকতা উপে যাবে, ম্লেচ্ছ খাদ্য খেলে তো রক্ষা নেই, কোনও প্রায়শ্চিত্তের ঝামা ঘষে সে ময়লা তোলা যাবে না—এই সব কথা সবিস্তারে লেখা হয়েছিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *লাইট অব দি ইষ্ট* পত্রিকায়। (এই সঙ্গে অবশ্য বিবেকানন্দের ব্যক্তি চরিত্রের উচ্ছসিত প্রশংসা সেখানে ছিল।)

সমাজ সংস্কারক বি এম মালাবারি তাঁর *ইন্ডিয়ান স্পেকটেটর* পত্রিকায় জানালেন, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রক্ষণশীলদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে বিতৃষ্ণার উল্টোপাক শুরু হয়েছে; রক্ষণশীল পত্রিকায় বলা হচ্ছে, 'ধর্ম-মহাসভায় চোখ-ধাঁধাঁনো আলোকে তাঁর আবির্ভাব—এখন দেখছি শুধুই ধোঁয়া, বিবেকানন্দের মতবাদ হিন্দুধর্মের পাতলা আবরণের তলায় ব্রাহ্মধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের জগাখিচুড়ি।' কলকাতার প্রভাবশালী *বঙ্গবাসী* পত্রিকার প্রচারের ফলে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের হিন্দুধর্মরক্ষী কর্তৃপক্ষ উক্ত মন্দিরে বিবেকানন্দের ঢোকা বন্ধ করে দিলেন।

খুশি হলেন না, হওয়া সম্ভব ছিলও না খ্রিস্টান মিশনারীদের পক্ষেও। তাঁদের অজস্র

ভারতবর্ষীয় সাময়িকপত্রে বিবেকানন্দ-সমালোচনার ঝড় উঠল। একদিকে তাঁরা বিবেকানন্দের তত্ত্বদৃষ্টিকে আক্রমণ করলেন, অন্যদিকে প্রচার করতে লাগলেন, বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য জনপ্রিয়তার মূলে তাঁর সুন্দর চেহারা এবং ঝলমলে পোশাক—তৎসহ আমেরিকানদের বৈচিত্র্যপ্রীতি। ফলাও করে জানাতে লাগলেন (সত্যমিথ্যার ধার না ধেরে) বিবেকানন্দ গোমাংসাহারী। তাঁরা জানাতেন, তাঁদের ধর্মান্তকরণের অর্থসংগ্রহে বিপুল ঘাটতির মূলে ওই অপরাধী লোকটি—এই একটি অস্ত্রে ভারতবর্ষে বধ হবেন।

অস্ত্রটি ধারালো তাতে সন্দেহ নেই কারণ রক্ষণশীল বলে চিহ্নিত বলা গঙ্গাধর তিলক যখন বিবেকানন্দের দেহান্তের পর *কেশরী* পত্রিকায় তাঁকে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তুলনা করেচিলেন, তখন পুনের সংস্কারপন্থী কাগজ *সুধাকর* বিদ্রূপ করে বলেছিল, ধন্য তিলক, একজন গো-খাদককে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাংলার সংস্কারপন্থী কাগজগুলি তো হিন্দুদের প্রতি ভালবাসায় অস্থির হয়ে বলেছিল, এ তোমরা কী করছ, বিবেকানন্দকে সন্ন্যাসী বলছ, সে যে শূদ্র তা কি জানো না? ইতিহাসের সকৌতুক বিধানে সংস্কারপন্থীরা রঘুনন্দনী বিধানকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন।

মাদ্রাজের সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে কিন্তু বিবেকানন্দের প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। মাদ্রাজ সংস্কার সভায় তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সমুদ্র লঙ্ঘন করে তাঁর আমেরিকা যাত্রার গুরুত্ব সম্বন্ধে মাদ্রাজের *হিন্দু* পত্রিকার সংস্কারপন্থী সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্যআয়ার (কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) বলেছিলেন, বিবেকানন্দ যেদিন সমুদ্রগামী জাহাজের কেবিনে পদার্পণ করেছিলেন সেদিন তিনি কুসংস্কারের মুণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার তাৎপর্য এখন কেবল সূক্ষ্মদর্শী মানুষেরই গোচর—ভবিষ্যতে তা ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ হবে। সম্পাদক ভগবান বুদ্ধের ভূমিকার সঙ্গে পর্যন্ত বিবেকানন্দের ভূমিকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। আর মালাবারি অত্যন্ত উল্লাসের সঙ্গে স্বামীজীর সমুদ্রযাত্রা আন্দোলন সমর্থনে উল্লেখ করেন। এ কথাও বলেন, 'তিনি দৃঢ় সহজ বুদ্ধির মানুষ, তাঁর দেশপ্রেম ভেজাল নয়, খাঁটি জিনিষ। হিন্দুদের পতনের আসল কারণ তিনি ধরতে পেরেছেন।'

এ সব সত্ত্বেও স্বামীজীর সঙ্গে মাদ্রাজের সংস্কারকদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধাক্কা লেগেছিল, যখন তিনি সংস্কারের নামে অতিরিক্ত দেশ ও জাতিনিন্দার সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে কেবল গালাগালির সাহিত্য জমিয়ে তুলে মানুষের মঙ্গল করা যায় না। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজের একটি তালিকা হাতে করে তার সমর্থনে সই জোগাড় করার কাজকেও তিনি শিরোপা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষতঃ তাঁকে ব্যস্ত করা হতো বিধবা বিয়ের প্রশ্ন নিয়ে—তিনি কি তা সমর্থন করেন? বিদ্যাসাগরের মস্ত ভক্ত, এবং বিধবা বিয়ের বিরোধী না হলেও, বিবেকানন্দের কাছে উচ্চবর্ণের কিছু নারীর জীবনের ওই সমস্যা

দেশের কোনও বড় সমস্যাই নয়, বিশেষতঃ যখন নিম্নবর্ণে বিধবা বিয়ে প্রচলিত (বিবেকানন্দ উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণকে একসঙ্গে জুড়েই ভারতবর্ষের কথা ভাবতেন) মূল সমস্যা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের। তাই উত্যক্ত হয়ে ওইসব 'বালক সংস্কারদের' বলেছিলেন, 'কোনও জাতির উন্নতি তার বিধবার স্বামীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে না।' তারপরেই তাঁর মূল কথাগুলি বেরিয়ে এসেছিল— 'তা নির্ভর করে সমগ্র জাতির অন্ন, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের উপরে।' অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা চাই—এবং চাই নিম্নবর্ণের জন্য মানুষের অধিকার। এই জন্যই তিনি 'সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেষ্ট' থিয়োরিকে চিহ্নিত করেছেন দুর্বলের উপরে সবলের উৎপীড়নের সাফাই হিসাবে।

'হেরিডিটারি ট্রান্সমিশন' থিয়োরি অনুযায়ী উচ্চবর্ণের বিশেষ অধিকার দাবী তাঁর কাছে 'দানবিক' বলে মনে হয়েছিল। সংস্কারকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, আমি খুচরো সংস্কারে বিশ্বাস করি না—আমি চাই 'আমূল সংস্কার', যা কয়েকটি লোকের উত্তেজনাপূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক বিধানদানের দ্বারা ঘটবে না, মূলদেশকে উত্তোলিত করে তা ঘটাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, বেদান্ত সত্যের প্রচার, যা মানুষকে দেবে আত্মশ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তি। সে শিক্ষা কোনও মানুষ বা সম্প্রদায়ের প্রিভিলেজ-দাবীকে ধর্মবিরোধী বিবেচনা করবে। সকলের জন্য সমসুযোগ—এই ছিল তাঁর দাবী। এবং সমতা ঘটাবার জন্য বিশেষকালে পতিতদের জন্য অধিক সুযোগ। তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, পতিতদের এই অধিক সুযোগ কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না, যদি একই সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক উজ্জীবন ঘটানো না যায়, তাহলে অখণ্ড জাতীয়তা আসবে না—পরন্তু নতুন অধিকার-ভোগী এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে। বিবেকানন্দের এই ধরণের বৈপ্লবিক চিন্তার শরিক হবার মতো মানসিক অবস্থায় সেকালের সংস্কারকরা ছিলেন না।

সেকালের রাজনৈতিকেরাও তা ছিলেন না। অল্পদিন পূর্বে গঠিত জাতীয় কংগ্রেস, সর্বভারতীয় সমাবেশ ঘটাতে পেরেছে, এই ঘটনার মূল্য তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেই কংগ্রেস জনবিচ্ছন্ন, উচ্চবর্গীয় মানুষদের আখড়া, দেশের মানুষের বাস্তব দুঃখকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির মতো ব্যাপারে কোনও সক্রিয় ভূমিকা তাদের নেই, কেবল ইংরেজ প্রভুর কাছে কিছু সুযোগ সুবিধার বিনীত প্রার্থনা। এই নত প্রার্থনা বিবেকানন্দের ঘোর বিতৃষ্ণার জিনিস। তিনি চেয়েছেন শক্তি এবং সংগ্রাম— সে জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ও আত্মবলিদান। তাঁর ভারতীয় বক্তৃতাবলিতে বারেবারে সেই আহ্বান। কংগ্রেসকে এ ক্ষেত্রে তিনি প্রস্তুত দেখেননি। উল্টোপক্ষে দেশের শিক্ষিত মহলে ইংরেজ শাসনের চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত বুদ্ধিও দেখেছিলেন। এই শাসন আপাতভাবে রাজকীয় শাসন হলেও তা যে আসলে সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের শাসন, যার মূল উদ্দেশ্য নিষ্ঠুর শোষণ ও ঘোর উৎপীড়ন, তার সম্বন্ধে সচেতনতা তখন শিক্ষিত মহলে বিশেষ দেখা যায়নি। সে সম্বন্ধে সচেতন করতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

বিবেকানন্দের ভারতীয় বক্তৃতাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কয়েকটি বক্তব্য বারে বারে এসেছে, এবং অসাধারণ প্রাণশক্তিপূর্ণ ভাষায় তা কথিত বলে (রোঁমা রোঁলা যাকে বৈদ্যুতিক শিহরণদায়ী বলেছেন) সমকাল ও পরবর্তীকালে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি এমন কতকগুলি মূল্যবোধ সৃষ্টি করেচিলেন যেগুলি পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনকালে অবশ্য গ্রাহ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল। তার মধ্যে ভারতীয় জীবনের ধর্মের গুরুত্বের কথা আছে। কিন্তু সে ধর্ম, আগেই বলা হয়েছে, দেশাচার বর্জিত নিত্যধর্মসত্য, সে সার্বভৌম সত্য কেবল ভারতের নয়, বিশ্বের সম্পদ—এবং তাতে বিশ্বের নিতান্ত প্রয়োজন। আর আছে ভারতীয়দের উদ্দেশে আত্মবিস্তারের প্রেরণা। আত্মসঙ্কুচিত থেকে ভারত কেবলই নিজের ক্ষতি করেছে, 'বিশ্ববিহীন বিজনে' অবস্থান তাকে বহিরাগতদের সহজ শিকারের বস্তু করেছে, খণ্ড জ্ঞানকে আঁকড়ে থেকে অগ্রাহ্য করেছে বিজ্ঞানকে, সাত্ত্বিকতার নামধারী তামসিকতার চর্চায় সে ঐহিক প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন থেকেছে, ফলে হেরে গিয়েছে ভারতবর্ষ। তাকে যদি জিততে হয় নৈতিক, আধ্যাত্মিক এমন কি আর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, তাহলে বিভিন্ন দেশে গিয়ে হিসাব মিলিয়ে নিতে হবে। 'বিস্তারই ধর্ম, সংকোচনই মৃত্যু'।

প্রত্যক্ষদর্শী রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন বিবেকানন্দের বাণী যুবক দলকে দুঃসাহসিক অভিযাত্রায়, আত্মত্যাগে প্রণোদিত করেছে। ঐহিক উন্নতির প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বারংবার কথিত উক্তি (রাজোগুণ চাই, পৃথিবী ভোগ করতে হবে, তবে আসবে ত্যাগ, ভিখারির ত্যাগের মূল্য নেই, ইন্দ্রিয়হীনের সংযম অর্থহীন) অধ্যাপক বিনয় সরকারের মতো সমাজবিজ্ঞানীকে বলতে প্ররোচিত করেছিল, বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতে বস্তুবাদের জনক। গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। দরিদ্র মানুষ যদি শিক্ষালয়ে না যায় তাহলে শিক্ষাকে নিয়ে যেতে হবে চাষার লাঙলের কাছে। স্বদেশী নেতা ও শিক্ষাবিদ অশ্বিনী কুমার দত্তকে তিনি বলেচিলেন, 'আপনি শিক্ষার কাজ নিয়ে আছেন, তাই হল আসল কাজ। আপনার ছাত্রদের চরিত্র বজ্রদৃঢ় করে তুলুন। আর অচ্ছুৎ, মুচি, মেথর ও তাদের মতো সকলের কাছে গিয়ে বলুন, তোমাদের মধ্যে আছে অসীম শক্তি যা দুনিয়া উল্টে ফেলতে পারবে। তাদের স্কুল বসান। তাদের গলায় পৈতে ঝুলিয়ে দিন।'

শিক্ষার সঙ্গে তেজ, বীর্য ও সংগ্রামকে স্বামীজী যুক্ত করতে চেয়েছিলেন—সেই সংগ্রামে এগিয়ে আসুক যুবকদল। বস্তুতপক্ষে তাঁর আহ্বানে যুবকদলই বিশেষভাবে সাড়া দিয়েছিল। তিনি ভারতের যে প্রদেশেই যেতেন, সেখানকার যুবকদের আহ্বান করতে বলতেন, ভরসা তোমাদের উপরই তোমরাই পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখবে, সৃষ্টি করবে নতুনকে। তাঁর বিশেষ আশা ছিল বাংলার যুবকদের উপর, যারা সহায় সম্বলহীন, কিন্তু যাদের আছে কল্পনাশক্তি ও উদ্দীপনা।